ঋত্বিক
চলচ্চিত্র কথা

বাঁধন সেনগুপ্ত

পুনশ্চ
৯এ নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুখবন্ধ

ঋত্বিকের সঙ্গে সামনাসামনি পরিচয় হবার আগে আমি তাঁকে প্রথম চিনি নিমাই ঘোষের ছবি 'ছিন্নমূল'-এর অভিনেতা হিসাবে। তার আগে আমি ঋত্বিককে চোখে দেখিনি কখনো। নিমাইবাবু ছিলেন আমাদের ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির একেবারে প্রথমদিকের সভ্যদের মধ্যে একজন। তিনি যখন 'ছিন্নমূল' ছবি করছেন, মাঝে মাঝে আমার কাছে আসতেন এবং ছবি সম্বন্ধে নানারকম গল্প করতেন। সেই ফাঁকে ঋত্বিকের কথাও মাঝে মাঝে উঠেছে। তিনি বলেছিলেন, 'আমি ওঁকে একটা অভিনয়ের সুযোগ দিয়েছি। ছেলেটির মধ্যে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে প্রচুর উৎসাহ রয়েছে।'

তারপরে বেশ কিছুকাল আমি ঋত্বিকের সঙ্গে সামনা-সামনি পরিচিত হইনি। ফিল্ম সোসাইটিরই একটা মিটিং-এ সে আসে এবং তখনই তার সাথে আমার প্রথম পরিচয়। ফিল্ম সোসাইটির বৈঠকে সে যে ঘন ঘন আসত তা নয়। কাজেই তখনও তাঁকে ভালো করে চেনবার সুযোগ হয়নি। আমার ধারণা সে সময়টা ঋত্বিক বোধহয় নাটক এবং মঞ্চ সম্পর্কেই আরও বেশি উৎসাহিত ছিল।

আরও কিছুকাল পরে, বেশ কিছুদিন পরে অরোরা কোম্পানির আপিসে ঋত্বিকের সঙ্গে আমার সত্যি করে পরিচয় হল। সে বোধহয়, যতদূর মনে পড়ে, সে সময় বোম্বেতে বিমল রায়ের সঙ্গে কাজ করছে, বিমল রায়ের ছবির চিত্রনাট্য লিখছে। তার কিছু আগে 'পথের পাঁচালী' ছবিটি মুক্তি পেয়েছে, ঋত্বিক সে ছবি দেখেছে এবং দেখে তার খুবই বেশিরকম ভালো লেগেছিল। সে কথা সে প্রাণ খুলে আমার কাছে বলে। কিন্তু আমার কাছে যে জিনিসটি সব চাইতে ভালো লেগেছিল সেটা সে যেভাবে ছবিটাকে বিশ্লেষণ করেছিল — তার কয়েকটা দৃশ্য — সেটা থেকে আমার মনে হয়েছিল, ঋত্বিক যদি ছবি করে তাহলে সে খুব ভালোই ছবি করবে। তারও পরে যখন 'অপরাজিত' ছবির সম্পাদনার কাজ হচ্ছে বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে তখন শুনলাম একটি ছবির প্রিন্ট সেখানে রয়েছে। সে ছবি হল ঋত্বিক ঘটকের প্রথম ছবি 'নাগরিক'। তৎক্ষণাৎ আমরা সেই ছবি দেখি। খুবই অসুবিধার মধ্যে তোলা হয়েছিল ছবিটা সেটা দেখলেই বোঝা যায়। তার বাইরের পালিশ একদমই নেই বলতে গেলে, কিন্তু তাও তার মধ্যে কতকগুলো এমন গুণের পরিচয় আমি পেয়েছিলাম যে তাতে নবীন পরিচালক সম্বন্ধে একটা প্রচণ্ড শ্রদ্ধা জাগে আমার মনে।

তার কিছুকাল পরে 'অযান্ত্রিক'-এর আবির্ভাব। 'নাগরিক' ছবি বাজারে দেখানো হয়নি। 'অযান্ত্রিক' ছবির প্রথম শোতে আমি উপস্থিত ছিলাম। এবং সে ছবি দেখে বুঝতে পেরেছিলাম একজন সত্যিকারের শিল্পী যদি সত্যিকারের কাজের সুযোগ পায়, তাহলে সে একধাপে কতদূর এগিয়ে যেতে পারে। 'অযান্ত্রিক' ছবি ব্যবসায়িকভাবে ভালো চলেনি। তার কারণটা

আমার কাছে খুব স্পষ্ট ছিল। ঋত্বিক বিষয়বস্তু নির্বাচনে একটা অসম সাহসের পরিচয় দিয়েছিল। ঠিক সেইজাতীয় ছবি তার আগে বাংলার চলচ্চিত্র জগতে কেউ করেনি। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে নীরস ছবি — নায়ক বলতে একজন গাড়ির ড্রাইভার এবং নায়িকা বোধহয় সেই গাড়িটাকে বলা চলে। সেখানে সাহসের পরিচয় বলতে একটা ছিল যে সেই গাড়িটার মধ্যে একটা মনুষ্যত্ব আরোপ করার চেষ্টা করা হয়েছিল, যাকে বলা যেতে পারে এক ধরনের anthropomorphism—সেটা যে সব জায়গায় উতরে ছিল সেটা আমি বলব না; কিন্তু বাংলার চিত্র জগতে কাজ করতে এসে, বাংলার দর্শকদের কথা মনে রেখে একজন শিল্পী যে এটা আদৌ করবার সাহস পেয়েছে সেটাই হচ্ছে আশ্চর্যের কথা। তারপরে 'অযান্ত্রিক'-এর, আমার কাছে, যেটা সবচেয়ে লক্ষ করবার মতো জিনিস কতকগুলো ছিল সেগুলো হচ্ছে, বিষয়বস্তু বাদ দিয়েও সে জিনিসটা অনেক ছবিতেই পাওয়া যেতে পারে, এক ধরনের দরদ, মানবিকতা। এগুলো অনেকের ছবিতেই লক্ষ করা যেতে পারে, কিন্তু যে সমস্ত গুণগুলো থাকলে একটা ছবি সত্যিকারের সার্থকতা অর্জন করতে পারে সেই ধরনের চলচ্চিত্রের কতগুলো বিশেষ গুণ 'অযান্ত্রিক'-এ প্রায়ই বহু জায়গায় লক্ষ করা যায়। আমি কয়েকটা উদাহরণ দেব। যাঁরা আগে দেখেছেন, তাঁরা দ্বিতীয়বার দেখবেন নিশ্চয়ই, এবং তাঁরা এগুলো লক্ষ করতে পারেন। এগুলো হচ্ছে বিশেষ করে কতকগুলো শট, যেখানে ঘটনা হয়তো কিছুই ঘটছে না, উপাদান সামান্যই। কিন্তু একটা বিশেষ context-এ এসে সেই শট এমন একটা কাব্যের পর্যায়ে উঠে গেছে, এমন একটা শক্তিশালী চেহারা নিয়েছে যেটা একমাত্র অত্যন্ত শক্তিশালী পরিচালকের পক্ষেই সম্ভব। আপনারা দেখবেন গাড়িটাকে নিয়ে কত কী করা হয়েছে। গাড়িটা কিছু না, একটা লেকের ধারে গাড়িটা চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সন্ধেবেলায়। তার দৃষ্টিকোণ, তার composition এমন আশ্চর্য, সেটা যেন একেবারে স্পষ্ট কথা বলছে। তারপর আর একটা দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে গাড়ির শুধু বনেট। বনেটের ওপর সেই ক্যাপটা রয়েছে। ঢাকনাটা খুলে বিমল তাতে জল ঢেলে ঢাকনিটায় তিনটে প্যাচ দিয়ে বন্ধ করে হাত দিয়ে, রুক্ষ হাত দিয়ে তিনটে চাপড় মারল ভালো করে বন্ধ করার জন্য। আর কিছুই না। পেছনে আকাশ, বনেটের সামনাটুকু আর বিমলের হাত—এ একটা আশ্চর্য জিনিস। তারপর এক পাগলের ব্যবহার আছে 'অযান্ত্রিক' ছবিতে। দুটো জায়গায় দেখা যাবে পাগলকে, দুটো বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাবে পাগল রাস্তার ধারে বসে রয়েছে। বিমলের গাড়ি তার সামনে দিয়ে চলে গেল। একেবারে ধুলো উড়িয়ে গেল, তারপর অনেক পরে ছবিতে দেখা গেল সে জল ছিটিয়ে গেল, কেননা বর্ষা গেছে। কিংবা হয়তো প্রথমবার জল ছিটিয়ে গেছে, দ্বিতীয়বার ধুলো উড়িয়ে গেল। কিন্তু দৃষ্টিকোণ একই, সবই এক। শুধু এই দুজায়গায় দুবার বিভিন্নভাবে যেন একই গানের সুর দুরকমভাবে শুনতে পেলাম আমরা। এরকম আশ্চর্য জিনিস 'অযান্ত্রিক' —এ বহু জায়গায় রয়েছে।

'অযান্ত্রিক'-এর পর ঋত্বিক মাত্র ছখানা ছবি করার সুযোগ পেয়েছিল। তার মধ্যে আমার পক্ষে দেখা সম্ভব হয়েছে মাত্র তিনখানা। 'কোমল গান্ধার' যখন দেখানো হয় তখন আমি কলকাতায় ছিলাম না। তারপর সে ছবি আর এমনি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে দেখানো হয়নি। 'তিতাস'—বাংলাদেশে তোলা 'তিতাস' ছবি এবং ঋত্বিকের শেষ ছবি 'যুক্তি-তক্কো-গপ্পো',

যখন দেখানো হয়েছে privately তখন আমার স্যুটিং-এর কাজ চলছে। আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়নি। যাই হোক 'সুবর্ণরেখা' ছবি মনে আছে। ঋত্বিক আমাকে নিজে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর পাশে বসিয়ে দেখিয়েছিল।

এই 'অযান্ত্রিক' থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ১৭।১৮ বছরে ঋত্বিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হবার সুযোগ কখনও হয়নি — যাকে বলে বেশ বসে আলাপ করা, আড্ডা মারা বা চলচ্চিত্রের নানান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা। সেই সুযোগ প্রায় আসেনি বললেই চলে। সত্যি বলতে কি ঋত্বিককে শেষ কবে সুস্থ দেখেছি সেটা চেষ্টা করে মনে করা কঠিন। তার কাজ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি; কিন্তু যাঁরা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন তাঁদের মুখে শুনেছি যে সে কাজ করার সময়ও, অনেক সময়ই অসুস্থ থাকত। কিন্তু আমার কাছে যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছে যে তার কোনো ছবি দেখে কখনও মনে হয়নি সেই অসুস্থতা একটুকুও, এতটুকুও সেই ছবির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। তাঁর বিষয়বস্তু যেরকম বলিষ্ঠ তাঁর বলার কায়দায় মধ্যেও সেরকম জোর ছিল। এটা একমাত্র সম্ভব হয় তখনই, যখন একজন শিল্পীর আদবকায়দাগুলো একেবারে মজ্জাগত হয়ে থাকে। ঋত্বিকের মধ্যে সেটা ছিল। এবং সেই বিশেষ গুণটুকু না থাকলে আমার মনে হয় না মহৎ শিল্পী হওয়া যায়। ঋত্বিককে তাই খুব কাছাকাছি না জেনেও, তাঁর ছবি যখনই দেখেছি তখনই মনে হয়েছে একে আমি খুব ভালো করে চিনি এবং এ আমার খুব কাছের লোক।

আর একটি কথা বলে আমি শেষ করব — একটা বিশেষ গুণ ঋত্বিকের ছবির। আমরা যারা প্রায় গত চল্লিশ বছর ধরে ছবি দেখেছি, তাদের মধ্যে তো প্রায় ত্রিশটা বছর কেটেছে হলিউডের ছবি দেখে, কেননা কলকাতায় তার বাইরে কিছু দেখবার সুযোগ ছিল না সে সময়টা। উনিশশো ত্রিশ বা পঁচিশ থেকে শুরু করে প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বা ষাট অবধি আমরা হলিউডের বাইরে খুব বেশি ছবি দেখতে পারিনি। আমাদের সকলের মধ্যেই তাই কিছু কিছু হলিউডের প্রভাব ঢুকে পড়েছে। কিন্তু ঋত্বিক এক রহস্যময় কারণে সম্পূর্ণ সে প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল; তাঁর মধ্যে হলিউডের কোনো ছাপ নেই। এটা যে কী করে হয়েছে, সেটা এখনও আমার কাছে রহস্য রয়ে গেছে। যদি প্রভাবের কথা বলতে হয়, আমার মনে হয়, ঋত্বিকের ছবিতে কিছুটা — কিছু কিছু সোভিয়েট ছবির প্রভাব লক্ষ করা যায়! কিন্তু সে প্রভাবটা — প্রভাব মানে সেখানে অনুকরণ নয়; কারণ ঋত্বিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার মৌলিকতা এবং সেটা সে শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিল। এই সোভিয়েট ছবির প্রভাব এবং সংলাপে, বিষয়বস্তুতে, ছবির পরিসমাপ্তিতে নাটকের প্রভাব তাঁর মধ্যে ছিল। এবং এই দুটো জিনিস দাঁড়িয়েছিল যে ভিত্তির ওপর সেটা একেবারে বাংলার মাটিতে বসানো। ঋত্বিক মনেপ্রাণে বাঙালি পরিচালক ছিল, বাঙালি শিল্পী ছিল — আমার থেকেও অনেক বেশি বাঙালি। আমার কাছে সেইটেই তাঁর সবচেয়ে বড়ো পরিচয় এবং সেইটেই তার সবচেয়ে মূল্যবান এবং লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

SATYAJIT RAY

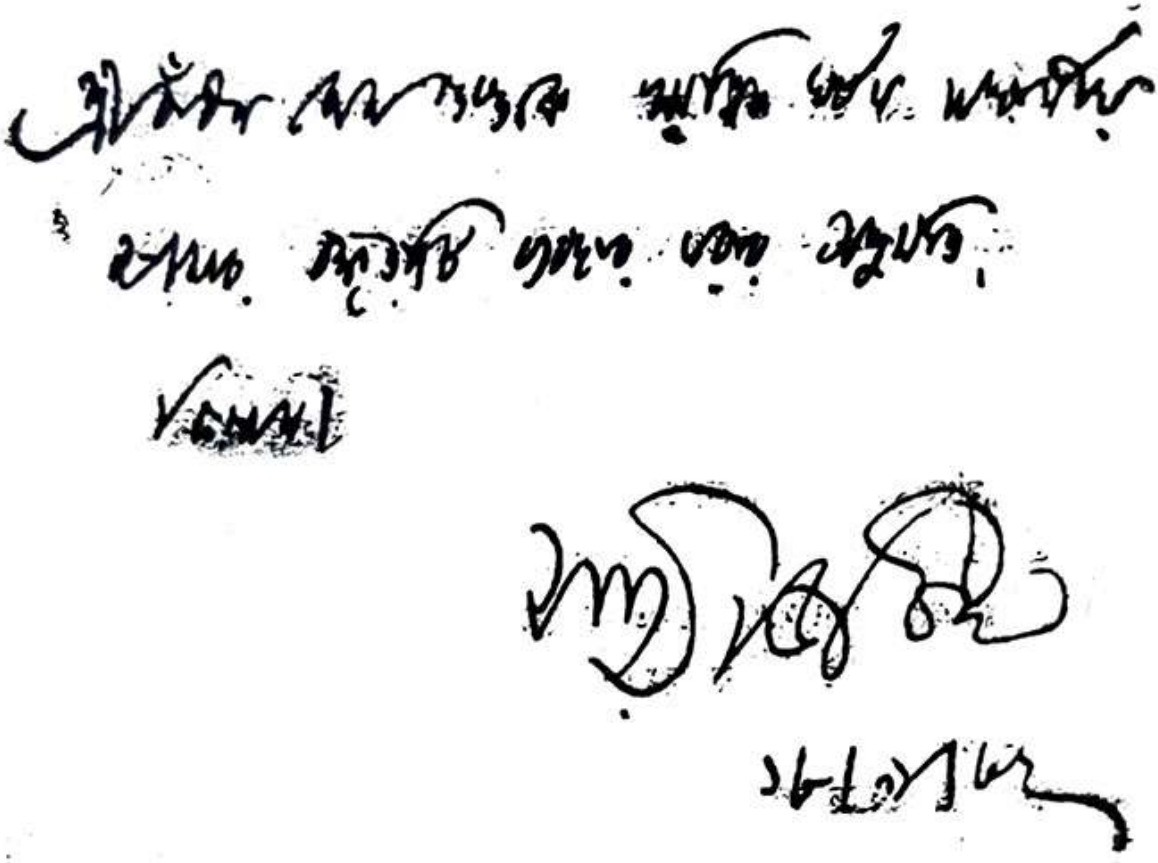

লেখকের নিবেদন

বাংলা তথা ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রের ইতিহাসের বিস্ময়কর একটি প্রতিভার নাম — ঋত্বিককুমার ঘটক। ভালোবাসায়, স্নেহে, প্রতিবাদে এবং বিদ্রোহে বাংলা চলচ্চিত্রে তিনি যেন এক নিঃসঙ্গ পুরুষ। নিজের নীতি ও বিশ্বাসে আপসহীন এই পরিচালককে নিয়ে প্রথম থেকেই তবু যেন আগ্রহ ও বিতর্কের অন্ত নেই। সম্পূর্ণ নিজস্ব, স্বতন্ত্র অথচ ভারতীয় জীবন ভাবনায় দীক্ষিত এই চলচ্চিত্রকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাফল্য এবং জীবনযাত্রার পরিণতি আমাদের একই সঙ্গে আনন্দিত ও বেদনামথিত করে। বাংলা চলচ্চিত্রে তিনি জীবিতাবস্থায় প্রতিভার যেন আশ্চর্য এক উদাহরণ হয়ে উঠেছিলেন। পাশাপাশি ব্যক্তিজীবনের বহুবিধ অস্থিরতা, অনিয়ম এবং হতাশার মধ্যে ব্যক্তিগত আত্মহননের প্রবণতায় শিশুর মতো সরল এই প্রতিভাবান শিল্পীটি আজীবন দগ্ধ। অথচ হৃদয়বৃত্তির সুকোমল অনুভূতিচর্চায় তাঁর গভীর আসক্তি আমাদের মনে নিরন্তর বিস্ময়ের উদ্রেক করে। চলচ্চিত্র শিল্পটি তাঁর কাছে বস্তুত একটি পবিত্র মাধ্যম যার ভেতর দিয়ে তিনি নিজেকে প্রতিনিয়ত আবিষ্কার করতে প্রয়াসী। এক ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা তিনি গোড়া থেকেই স্বীকার করতেন। ফলে সামাজিক ক্ষেত্রেও দায়বদ্ধ বা কমিটেড্ শিল্পী হিসেবে নিজেকে সংজ্ঞায়িত করাই ছিল তাঁর ধর্ম। নিজেকে গভীরভাবে চেনার জন্যে সুকঠিন এক আত্মসমীক্ষার পথে এদেশে ঋত্বিকই ছিলেন অগ্রপথিক। তাঁর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভালোবাসা বা ক্রোধ, প্রতিবাদ এবং নির্মোহ এই সব কিছুর মধ্যেই তাঁর ছবি বিশেষ একটা প্যাটার্ন এবং পরিণতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে এবং এরই মধ্যে দর্শক পরোক্ষে খুঁজে পেতেন চিন্তা এবং অস্তিত্বের আশ্চর্য এক ধরনের নৈকট্য। স্বভাবতই তিনি তাঁর চিন্তায় ও দর্শনে প্রধানত লৌকিক মননে আস্থাবান। লোকায়ত জীবনের শাশ্বত সত্য ও প্রকরণের মধ্যেই অনুসন্ধান করতেন তিনি আধুনিক জীবনমানসের খণ্ডিত ট্র্যাজেডির চিরন্তন সেই উৎসকে।

বলা বাহুল্য, শিল্পের বয়নে ও চর্চায় নিঃসন্দেহে ঋত্বিক বাঙালি। যে জীবনের খণ্ডিত রূপ বঙ্গবিভাগের ফলে আজ ইতিহাসের ট্র্যাজিক উল্লাসে পীড়িত তা নিরন্তর তাঁকে কষ্ট দিত। সহজে তাই তিনি ভুলতে পারেননি এই উপমহাদেশের মর্মান্তিক হঠকারী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে। ফেলে আসা সেই জীবনের সুচারু সংগীতের বাহার প্রায়শই তাঁর শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁকে নস্টালজিক করে তুলত। শিক্ষায়, আভিজাত্যে, পারিবারিক জীবনে ভারতীয় ঐতিহ্যের পাশাপাশি ইউরোপীয় চিন্তাধারার সঙ্গেও তিনি সবিশেষ পরিচিত ছিলেন। কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁকে প্রভাবিত করেছে প্রধানত তাঁর ভারতীয় মনন যা ইতিপূর্বে আর কারো কর্মের ক্ষেত্রে তেমন তীব্র হয়ে ওঠেনি। নিজস্ব ভাবনা ও টেকনিকের ক্ষেত্রেও তিনি বেপরোয়াভাবে নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পক্ষপাতী। প্রথাগত পদ্ধতিকে তাই তিনি তেমন সিরিয়াসলি কখনোই মেনে চলতে চাইতেন না। বরং অনেক সময় তিনি তারই আবিষ্কৃত যে

নতুন পদ্ধতিটি অনুসরণ করতেন সেটাই পরবর্তীকালে প্রথায় রূপান্তরিত হয়েছে। এক হিসেবে তিনি ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের নব্য রূপকার। শিল্পই ছিল তাঁর কাছে সত্যের প্রতিনিধি। এবিষয়ে প্রায়ই তিনি রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি স্মরণ করতেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'প্রত্যেক শিল্প একমাত্র সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। শুধুমাত্র সত্য দ্বারা শিল্প সৃষ্টি সম্ভব নয় একথা সত্যি কিন্তু সত্য ব্যতীত শিল্প সম্পূর্ণ হয় না।'

ঋত্বিকের প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'অযান্ত্রিক' (১৯৫৮) চলচ্চিত্র রসিকদের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। প্রথম থেকে এই সমাদর থাকা সত্ত্বেও প্রায় পঁচিশ বছর ব্যাপী পরিচালক জীবনে ঋত্বিকের মুক্তিপ্রাপ্ত কাহিনিচিত্রের সংখ্যা মাত্র আট। মুক্তিপ্রাপ্ত তথ্যচিত্র বা স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবির সংখ্যাও সর্বাধিক দশ। এছাড়া আরো প্রায় কুড়িটি চিত্রের কাজ প্রায়-সমাপ্ত -অসমাপ্ত বা আংশিক সমাপ্ত হয়ে বাক্সবন্দি। বেঁচে থাকার সময় তাঁর ছবি কখনোই ব্যাপকভাবে টিকিটঘরের আনুকূল্য পায়নি। একমাত্র 'মেঘে ঢাকা তারা'ই বক্স অফিসের কিঞ্চিৎ সমর্থন লাভ করেছিল বলা চলে। অথচ মৃত্যুর পর থেকেই ঋত্বিকের ছবির জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুত সাম্প্রতিককালে ভালো বাংলা ছবির আনুপাতিক অভাব একালের নতুন দর্শকশ্রেণি বা প্রজন্মকে তাঁর সৃষ্ট শিল্পগুণ সমন্বিত ছবি সম্পর্কে উত্তরোত্তর আগ্রহী করে তুলেছে।

অবশ্য ঋত্বিক যতদিন এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ততদিনই তিনি এই শিল্পের বাণিজ্য মহলের রাঘব বোয়ালদের কাছে প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত। তাই প্রথম থেকেই তাঁর ছবির পরিবেশনা বা প্রচারের সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। প্রধানত পরিবেশকের অভাবেই তাঁর প্রথম শিল্পকীর্তি কাহিনিচিত্র 'নাগরিক' (১৯৫২) তাঁর মৃত্যুর পরে অর্থাৎ দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে মুক্তি পাবার সুযোগ পায়। তা সত্ত্বেও তিনি শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে আমৃত্যুকাল আপসহীন এক যোদ্ধার মতোই চলচ্চিত্রের প্রকৃত বুদ্ধিদীপ্ত দর্শকসমাজের কাছে সম্মানিত ছিলেন এবং এখনো তরুণ পরিচালকের কাছে তিনি উজ্জ্বলতম এক ব্যক্তিত্ব হিসেবেই মান্য। কেননা, চলচ্চিত্র শিল্পে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠালাভে ব্যর্থতা বা চরম আর্থিক ও মানসিক সঙ্কটের মধ্যেও তাঁর সেই আপসহীন ব্যক্তিত্ব কখনো মাথা নোয়ায়নি।

ঋত্বিকের চলচ্চিত্র সম্পর্কে গভীর আগ্রহ নিয়ে বিদেশিদের মধ্যে সর্বপ্রথম ১৯৬৫ সালে এগিয়ে এসেছিলেন Georges Sadoul. তিনিই সে সময় প্রথম উৎসাহী হয়ে ঋত্বিকের 'সুবর্ণরেখা' ছবিটি, 'Canes, Locarno, Moscow or Venice' চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের পরিকল্পনা করেছিলেন। প্যারিস থেকে Canes Festival-এ যাবার আমন্ত্রণ পেয়ে বেশ কয়েক হাজার টাকা খরচ করে ছবিটির ফরাসি সাব-টাইটেল শেষ করেও অবশেষে ভারত সরকার প্রয়োজনীয় বিদেশি মুদ্রা মঞ্জুর না করায় ছবিটি সেদিন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি। Venice উৎসবে আমন্ত্রণ পাবার পরেও অনুরূপ ঘটনাই ঘটে। অথচ এই দুই ঐতিহ্যপূর্ণ উৎসবে ছবির গুণপনার বিচারে একমাত্র ঋত্বিকের ছবিটিই সর্বপ্রথম নজিরবিহীনভাবে বেসরকারি আমন্ত্রণে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল। ১৯৬৫ সালে Principal, Film Institute of India, Poona -কে লেখা চিঠিতে এ নিয়ে পুনর্বিবেচনার আবেদন করেও কোনো ফল পাওয়া যায়নি।

অবশ্য ইতিপূর্বেই ১৯৬১ সালে British Film Institute -এর Director স্বয়ং James Quinn -এর সঙ্গে যোগাযোগের পর 'অযান্ত্রিক' ছবিটি London Film Festival -এর জন্যে সেখানে পাঠানো হয়। কিন্তু লন্ডনে শেষ পর্যন্ত 'প্রদর্শনের সময়াভাবে' ছবিটি না দেখিয়েই British Film Institute ফেরত দেন। এই প্রতিযোগিতার বাইরে থাকলেও ঋত্বিকের 'বাড়া থেকে পালিয়ে' ছবিটির একটি শো সেবারে লন্ডনে অবশেষে প্রদর্শিত হয়।

এদিকে ঋত্বিকের প্রয়াণের পাঁচ বছর পরেই ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে Netherlands -এ 'First European tribute to Ritwick Ghatak' -এর আয়োজন করার জন্যে ঋত্বিকের চারটি ছবি (অযান্ত্রিক, মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার, সুবর্ণরেখা) চেয়ে পাঠান Rotterdam Arts Foundation, Film International, Netherlands. এঁরাই ইতিপূর্বে সত্যজিৎ রায় এবং জাপানের Kurosawa এবং বিশ্বের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকারদের ছবি নিয়ে প্রতিবৎসর উৎসবের আয়োজন করে আসছেন। আমন্ত্রণকারীদের পক্ষ থেকে Hubert Bals ও Monica Tegelaar আমন্ত্রণপত্রে ঋত্বিক পত্নীকে লিখেছিলেন — We absolutely want to dedicate this year's homage to your Late husband, Mr. Ritwick Ghatak, a very great film maker who has not as of yet had in Europe the attention he deserves. কিন্তু শ্রীমতী সুরমা ঘটকের ঠিকানায় লেখা চিঠিটা কলকাতায় পাঠানো সত্ত্বেও মূল চিঠিখানা দুর্ভাগ্যবশত আজও তিনি হাতেই পাননি। বোম্বাই থেকে মণি কাউল শ্রীমতী ঘটকের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে একটি প্রতিলিপি সে সময় আগ্রহী হয়ে পাঠান। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওই উৎসবে ঋত্বিকের ছাত্র মণি কাউলের ছবিও আমন্ত্রিত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে ফরাসি বিদুষী মহিলা দেমিনিক সারফাতি কলকাতা ফিল্মোৎসবে (১৯৮২) এসে উৎসবের বাইরে ঘুরে ঘুরে সত্যজিৎ রায়ের বারোটি ছবি, মৃণাল সেনের নয়টি ও ঋত্বিক ঘটকের আটটি ছবির মধ্যে ছয়টি ছবি তাঁর দেশে প্রদর্শনের জন্য নির্বাচন করে ফেলেন। এই ছবি নিয়ে আগামী বসন্তে (১৯৮২) প্যারিসে উল্লেখযোগ্য ভারতীয় ছবির উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে যেখানে একই সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয় চলচ্চিত্রকারদের কর্মকৃতিও প্রদর্শিত হবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে গত জুলাই মাসে ফিল্ম জার্নালিস্টদের জন্যে আয়োজিত ঋত্বিক ছবির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে লন্ডনে। অত্যন্ত সফল এই অনুষ্ঠানে ঋত্বিকের চারটি ছবি (অযান্ত্রিক, মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার ও সুবর্ণরেখা) নিয়ে British Film Journalist Association যে উৎসবের ব্যবস্থা করেছিলেন তার মূলে ছিলেন প্রখ্যাত British Film Journalist ডেরেক ম্যালকম ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ। লন্ডনে এঁদেরই উৎসাহ এবং সহযোগিতায় London Film যে Journalists Association -এর পত্রিকা Sight and Sound -এ ম্যালকমের ঋত্বিক বিষয়ক একটি মূল্যবান নিবন্ধ 'Tiger' প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া জনৈক ফরাসি চলচ্চিত্র সমালোচকও ঋত্বিক বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনায় সম্প্রতি হাত দিয়েছেন বলে খবরে প্রকাশ।

পাশাপাশি সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে (১৯৮২) লন্ডনে ভারত সরকারের Directorate of Film Festivals, National Development Corporation Limited আয়োজিত Cinema India Programme অনুসারে National Film Theatre, London -এ Festival of India 1982 অনুষ্ঠানেও Ritwick Retrospective সাফল্যের সঙ্গে প্রদর্শিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে Ritwick Ghatak [An attempt to explore his cinemative perception with excerpts from essays by Ghatak and on Ghatak] ইংরেজিতে ছাপা মূল্যবান এই সংকলিত স্মারকগ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন শম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোট ১২০ পৃষ্ঠার এই স্মারকগ্রন্থে ঋত্বিকের আটটি ছবি ও দুটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি (Fear ও Rendezvous) সম্পর্কে ঋত্বিকসহ অন্যান্য কয়েকজনের মতামত, তথ্যাদি ও অসংখ্য ছবি স্থান পেয়েছে। স্মারকগ্রন্থটি ওই উৎসবে বিদেশি দর্শকদের কাছে বিতরণের উদ্দেশ্যে Centre for Development of Instructional Technology-র মাধ্যমে প্রকাশিত।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, ঋত্বিকের প্রতিভার যোগ্য মূল্যায়ন ওই সব দেশেও এখন শুরু হয়েছে। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত শিল্প গুণান্বিত ছবির প্রশংসায় মেতে উঠেছেন ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ চিত্র সমালোচকের দল। এইভাবে ক্রমশ বিশ্বের সাধারণ দর্শকের হৃদয়ে তাঁর ছবির আবেদন পৌঁছতে সক্ষম হচ্ছে।

আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা প্রায়শই দেশের প্রতিভাকে বিচারের সময় বিদেশের মতামতের প্রতি অধিকতর আস্থাবান। সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রেও একই অভিজ্ঞতা ঘটেছে। অথচ ঋত্বিকের জীবিতাবস্থায় তাঁকে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন UNESCO -এর পক্ষ থেকে Zerry Toeplitz তাঁর Indian Films and Western Audiences নিবন্ধে (Paris Dec 23, 1964)। জুরিখের পত্রিকা Die Tat, Film-telegramm (হামবুর্গ), Die Welt (পশ্চিম বার্লিন) ছাড়াও Kirche and Film-Bethel bei Befeld, Film-Bild-Ton-Munchen, Critish Film-en Televishe-Bulletin Hillversen, Nene Zurcher Zeitung ও Der Furche Wien প্রভৃতি পত্রিকাতে ঋত্বিকের 'অযান্ত্রিক' ও 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' উচ্চ প্রশংসিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারি স্তরে অবহেলা ও উৎসাহের অভাবে তাঁর ছবি জীবিতাবস্থায় বিশ্বের দর্শক সমাজের কাছে পৌঁছতে পারেনি।

অন্যদিকে, আমাদের দেশে ঋত্বিকের প্রথম ছবি 'নাগরিক' দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে নানাপ্রকার ছলছুতোর কারণে বাক্সবন্দী ছিল। এ নিয়ে প্রভাবশালী মহলে তেমন জোরালো কোনো প্রতিক্রিয়া এই দীর্ঘ সময়ে গড়ে ওঠেনি। এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরে যখন অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে 'নাগরিক' ও 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' মুক্তি পেল তখনও ছবি দুটি প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে সুবিচার পায়নি। ঋত্বিক ঘটক জন্মোৎসব পালন প্রস্তুতি কমিটিপক্ষ থেকে 'ঋত্বিক ঘটক, তাঁর চলচ্চিত্র মুক্তি প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন' নামে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে এই প্রশ্নটি তুলে লেখা হয়,... 'এই ছবিটির মুক্তিকে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্র জগতে যে আলোড়ন হওয়া উচিত ছিল তার অভাব আমাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে Film Club গুলোর উদাসীনতা এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকাও লক্ষ করার মতো। কিন্তু আমাদের আঘাত দিয়েছে বর্তমান সরকারের কিছু ভূমিকা। যখন অপসংস্কৃতি এবং মেরুদণ্ডহীন বুদ্ধিজীবীদের

ন্যক্কারজনক ভূমিকা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগৎকে প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত করে চলেছে তার বিরুদ্ধে যে মানুষটি আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন এবং যাকে কেন্দ্র করে বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব, তার ছবিকে যখন প্রমোদজনক ছবি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তখন ভাবতে হবে আমরা আদৌ সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ চাই কিনা। নাহলে নাগরিক ও যুক্তি তক্কো আর গপ্পো প্রমোদকর মুক্ত হয় না কেন?' (অজয় বসু রায় ও সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়)। 'নাগরিক' ছবিটি মাত্র এক সপ্তাহের জন্য বুক করা ছিল এবং 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'র Fixed Booking ছিল মাত্র দুই সপ্তাহের জন্যে। অথচ 'নাগরিক'-এর পতিটি শো হাউসফুল এবং New Empire -এর মালিকপক্ষ প্রচণ্ড বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন নাগরিক ডিস্ট্রিবিউটারের ছবি তুলে নেওয়ার এই হঠকারী সিদ্ধান্ত দেখে। যুক্তি তক্কো আর গপ্পোর ক্ষেত্রেও ছিল এই একই অবস্থা। অথচ এ নিয়ে এখানকার সংবাদপত্রে সে সময় কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়নি।

সেই সময় সরকার পশ্চিমবঙ্গে ঋত্বিকের এই দুটি ছবিকে মাত্র তিন সপ্তাহের জন্য করমুক্ত করেছিলেন। বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার অবশ্য ঋত্বিক সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহী। বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশনার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর প্রকাশন ব্যয়ের সত্তর ভাগ ব্যয় অনুদান হিসেবে বরাদ্দ করে ঋত্বিকের চলচ্চিত্র প্রতিভা সম্পর্কে সরকারের আগ্রহ ও শ্রদ্ধার পরিচয় দান করেছেন। এছাড়া এই সরকার নানাভাবে ঋত্বিক স্মৃতি সংরক্ষণেও আগ্রহী।

অন্যদিকে, দুঃখের বিষয় ঋত্বিকের মৃত্যুর আগে বা পরে তাঁর চিত্রকর্ম বিষয়ে কোনো মৌলিক আলোচনা গ্রন্থ এ যাবৎ প্রকাশিত হয়নি। মৃত্যুর পরে শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে প্রধানত সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটার মুখপত্র মাসিক পত্রিকা 'চিত্রবীক্ষণ' ঋত্বিক সংখ্যা (১৯৭৬) ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির মুখপত্র 'চিত্রভাষ' (ঋত্বিক-স্মরণে বিশেষ সংখ্যা), নৈহাটির সিনে ক্লাব অব নৈহাটির মুখপত্র 'দৃশ্য' (জানুয়ারি ১৯৭৭) ও সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটার চলচ্চিত্র বিষয়ক ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'চিত্রকল্প' (১৫)-তে বেশ কিছু ঋত্বিক বিষয়ক আলোচনা, সাক্ষাৎকার, প্রবন্ধ এবং ঋত্বিকের কিছু রচনা, ছবি এবং চিত্রনাট্য প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। জীবিতাবস্থায় একমাত্র ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউট প্রকাশিত 'মুভি মনতাজ' পত্রিকা ঋত্বিকের চলচ্চিত্র নিয়ে আয়োজিত উৎসব (১৯৬৭) উপলক্ষে যে বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশ করেছিলেন ঋত্বিক আলোচনায় তাকেই অন্যতম পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। এছাড়াও পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে মৃত্যুর পরে কিছু ছোটোবড়ো আলোচনা নিবন্ধ বা সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। কোথাও কোথাও ঋত্বিক স্মরণে ঋত্বিক চলচ্চিত্র উৎসবেরও আয়োজন করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, নতুন দিল্লির Patriot পত্রিকা সাময়িক পত্রে Sunday, March 21, 1976, গৌতম কাউলের The Stormy Petrel of Indian Cinema এবং The Sunday Statesmen (New Delhi Edition March 21, 1976) -এ প্রকাশিত আরতি ঠাকুরের A Man of Deep Social Consciousness ও কুমার শাহানির Nature in the end, is grandly in different নিবন্ধগুলিও অত্যন্ত মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্য।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত ঋত্বিক চলচ্চিত্র বিষয়ক একমাত্র সঙ্কলন গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছিলেন 'চলচ্চিত্রের স্রষ্টারা' গ্রন্থের লেখক শ্রীরজত রায়। তাঁর গ্রন্থে সঙ্কলিত নিবন্ধগুলি প্রায় সবগুলিই ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। এবং সেগুলি ঋত্বিকের চলচ্চিত্রকে অনুশীলন করতে বা বুঝতে অবশ্যই অপরিহার্য।

বর্তমানে তাই ঋত্বিকের চলচ্চিত্রকর্ম বা প্রতিভা সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান, আলোচনা এবং গবেষণার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাঁর চিত্রকর্ম পুনর্মূল্যায়নের বাস্তব প্রয়োজনীয়তাকে স্মরণে রেখেই বর্তমান লেখকের এই গ্রন্থ প্রণয়নের সামান্য প্রয়াস। বলা বাহুল্য, তাই ঋত্বিক চলচ্চিত্র অনুরাগী মহলের পক্ষে গ্রন্থটিকে অবশ্যই প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে গ্রহণ করাই ভালো। বস্তুত লেখকের সঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের প্রায় এক দশকের ব্যক্তিগত পরিচয় ও তাঁর ছবি সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ের আলোচনাই এ গ্রন্থ প্রণয়নে লেখককে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করেছে বলা চলে। এ ব্যাপারে ঋত্বিক পত্নী শ্রীমতী সুরমা ঘটক (তিনিও ব্যক্তিগতভাবে দীর্ঘদিন ধরে লেখকের সবিশেষ পরিচিত) ও ঋত্বিক তনয় শ্রীমান ঋতবান নানাভাবে লেখকের তথ্য, মতামত, মূল্যবান ছবি, কাগজপত্র, চিঠি ইত্যাদি দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। শ্রীমতী ঘটকের 'ঋত্বিক' গ্রন্থটি থেকেও অনেক তথ্য ও উদ্ধৃতি প্রয়োজনে এই গ্রন্থে ব্যবহৃত। লেখক সম্পর্কে তাঁর একটি লিখিত মতামত পেয়ে আমি উৎসাহিত।

উপরন্তু বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বা গ্রন্থ থেকে যে সব সূত্র বা তথ্যাদি এই গ্রন্থে প্রয়োজনানুসারে ব্যবহৃত হয়েছে তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা গ্রন্থের শেষে সবিশেষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখিত।

এই গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখে দেবার জন্যে শ্রদ্ধেয় পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায়কে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে তাঁর অসম্ভব কর্মব্যস্ততার কারণে তিনি নতুন কোনো ভূমিকা লিখে দিতে না পারলেও ঋত্বিক স্মরণসভায় তাঁর প্রদত্ত মূল্যবান ভাষণটি (ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইন্ডিয়া আয়োজিত স্মরণসভা, সরলা রায় মেমোরিয়াল হল, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬) আমাকে অনুগ্রহ করে এই গ্রন্থে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। আমি সেটিকে গ্রন্থে তাঁর সম্মতি-অনুসারে মুখবন্ধ হিসেবে ব্যবহার করেছি। এতে গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস। তাঁর এই ঋত্বিক বিষয়ক মূল্যায়নটি নিঃসন্দেহেই ঐতিহাসিক। এটিকে গ্রন্থে ব্যবহার করতে পেরে আমি তৃপ্ত এবং এজন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকর্মে সাহায্য করেছেন স্নেহভাজন পরিতোষ দাস ও সমীর সেনগুপ্ত। ঋত্বিকের মুম্বাইতে (পুণা) প্রবাসজীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রয়াত ড. নীহাররঞ্জন রায়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীপ্রণবরঞ্জন রায়। ডক্টর বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায় ও 'বিশ্বজ্ঞান'-এর দেবকুমার বসু, কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত। সতীর্থ দেবব্রত ঘোষ (নৈহাটি) ও কয়েকটি ক্ষেত্রে তথ্য ও পত্র-পত্রিকা দিয়ে আমায় অনেক সাহায্য করেছেন। এছাড়া ঋত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, ট্রাস্টের সদস্যবৃন্দ এবং দীর্ঘকালের সঙ্গী শ্রীমহেন্দ্র কুমারের কাছেও নানা ব্যাপারে আমি ঋণী। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত ছবির অধিকাংশই ট্রাস্টের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্যবিভাগ প্রদত্ত আংশিক আর্থিক আনুকূল্যে প্রকাশিত। শ্রদ্ধেয় তথ্যমন্ত্রী প্রভাস ফদিকার ব্যক্তিগতভাবে এ গ্রন্থের প্রকাশন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে এগিয়ে এসেছেন। আমি ও শ্রীমান ঋতবান মহাকরণে গিয়ে এ ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ ও

সাহায্য না পেলে শিশির মঞ্চে এই গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান ও অন্যান্য ব্যয়ভার বহন করা সম্ভবপর হতনা। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থপ্রণয়ন কালে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন স্নেহাস্পদা মিতালি রায়, সঙ্গীতা, রাখী ও শান্তা সেনগুপ্ত এবং কুমারী অঞ্জনা ঝা।

শ্রীমতী বর্ণালী সেনগুপ্ত গ্রন্থটি যথাযথভাবে সমাপ্ত করার কাজে নিরন্তর উৎসাহ ও প্রেরণা দান করেছেন। এঁদের সকলের প্রতি আমার ঋণ অপরিশোধ্য হলেও ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ খুবই কম।

'নবজাতক প্রকাশন'-এর কর্ণধার বন্ধুবর মজহারুল ইসলাম ঋত্বিক ঘটকের আজীবন অনুরাগী হিসেবে এই গ্রন্থ প্রণয়নের প্রাথমিক পরিকল্পনা থেকেই যুক্ত। গ্রন্থটি প্রকাশনার দায়িত্ব বহন করে তিনি আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

একদা ঋত্বিকের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, ঋত্বিকের ছবির প্রচার পরিকল্পনাবিদ্ শিল্পী খালেদ চৌধুরী প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অঙ্কনের দায়িত্ব গ্রহণ করে গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন বলে আমার বিশ্বাস।

পরিশেষে নিবেদন, যেহেতু এটি ঋত্বিক সম্পর্কে প্রাথমিক প্রচেষ্টা মাত্র সেহেতু এতে হয়তো নানাবিধ ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থেকে যেতে পারে। সহৃদয় পাঠকের কাছে তাই লেখকের আবেদন এই যে, সেক্ষেত্রে কোনও মতামত বা ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে লেখক কর্তৃক তা সাদরে বিবেচিত হবে এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অবশ্যই পরবর্তী সংস্করণে যথাযথভাবে তা উল্লেখিত এবং সংশোধিত হবে।

অবশেষে ঋত্বিকের কথাই পুনরায় স্মরণ করি — 'জীবন মৃত্যুকে অস্বীকার করে। জন্মই জীবন। শিল্প জন্ম।' নমস্কারান্তে — ৪ঠা নভেম্বর ১৯৮২

বাঁধন সেনগুপ্ত

বিষয় সূচি

◆ **প্রথম পরিচ্ছেদ** .. ৪১-৯৬
প্রস্তুতিপর্ব ও ঋত্বিকের চলচ্চিত্রকর্ম

◆ **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ** .. ৯৭-১১৬
ঋত্বিকের চিত্রনাট্য, সম্পাদনা, চিত্রগ্রহণ, ধ্বনি ও সংগীত

◆ **তৃতীয় পরিচ্ছেদ** .. ১১৭-১২৬
ঋত্বিকের অসমাপ্ত ছবির কথা

◆ **চতুর্থ পরিচ্ছেদ** .. ১২৭-১৩২
ঋত্বিকের পরিবার ও ব্যক্তিজীবনের রূপরেখা

◆ **পঞ্চম পরিচ্ছেদ** .. ১৩৩-১৪১
ঋত্বিক নির্মিত চলচ্চিত্রের তালিকা ও অন্যান্য তথ্য

◆ **পরিশিষ্ট ১** .. ১৪২-১৪৫
চলচ্চিত্রশিল্পী ও কলাকুশলীদের সম্পর্কে

◆ **পরিশিষ্ট ২** .. ১৪৬-১৪৯
আবার যদি ছবি করার সুযোগ পাই

◆ **পরিশিষ্ট ৩** .. ১৫০-১৫২
রামকিংকর—একজন ব্যক্তিত্বের অনুসন্ধানে

◆ **পরিশিষ্ট ৪** .. ১৫৩-১৫৪
রটারডাম (নেদারল্যান্ডস) ঋত্বিক চলচ্চিত্র উৎসবের আমন্ত্রনপত্র

◆ **পরিশিষ্ট ৫** .. ১৫৫-১৬৪
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদকের উদ্দেশে লিখিত ঋত্বিকের একটি পত্রের খসড়া

◆ **পরিশিষ্ট ৬** .. ১৬৫-১৭১
পুণায় অধ্যক্ষকে লেখা ঋত্বিকের পত্র
◆ **পরিশিষ্ট ৭** .. ১৭২-১৮০
কয়েকটি সাক্ষাৎকারের সময় ঋত্বিক ঘটকের বক্তব্য
—'চিত্রবীক্ষণ' কর্তৃক গৃহীত
বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে ঋত্বিকের ছবি
◆ **পরিশিষ্ট ৮** .. ১৮১-১৮৪
প্রথম প্রকাশের পর (১৯৮২)
সমালোচকদের মতামত

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রস্তুতিপর্ব ও ঋত্বিকের চলচ্চিত্রকর্ম

॥ এক ॥

যে কোনো শিল্পের মূলকথা হল সততা এবং যে শিল্পের মধ্যে জীবনের সততা ও সত্যের তীব্রতা বেশি, সেটা মহৎ শিল্প হিসেবেও ততবেশি পরিমাণে সার্থক। শাশ্বত সত্য সামগ্রিকভাবে পরিপূর্ণ শিল্পেরই সার্থক পরিণতি। অবশ্য শিল্পের প্রকাশের মধ্যে মাধ্যমের ব্যাপ্তি অনেক বেশি। কিন্তু প্রত্যেকটি আবার কম-বেশি পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। ফলে মাধ্যম ব্যাপারটাই প্রথমত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো চিত্রকলা, সাহিত্য কিংবা সংগীতের একটা ধারাবাহিকতা আছে। পৃথিবীর তাবৎ মনুষ্যসমাজ এবং মানসিক প্রকৃতিসমূহ এগুলোর মাধ্যমেই পরিশীলিত। তুলনামূলকভাবে চলচ্চিত্র এই ধারারই সর্বকনিষ্ঠ শাখা। যদিও মানবজাতির শৈল্পিক ক্ষুধা দীর্ঘকাল শিল্পকলা, সংগীত বা সাহিত্যের দ্বারাই পরিপুষ্ট হয়ে এসেছে। কিন্তু যে মুহূর্তে চলচ্চিত্র এল তখন তার শিল্পবোধ এরই মাধ্যমে বিভিন্নমুখী শিল্পের মধ্যে পরিপূর্ণ একটা সমন্বয়ের ক্ষেত্রকে খুঁজে পেল। নিঃসন্দেহে শিল্পক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী একটা হাতিয়ার এভাবে মানুষের করায়ত্ত হয়ে গেল। চলচ্চিত্রই সম্ভবত একমাত্র মাধ্যম যার মধ্যে সৃষ্টির বা নন্দনভাবনার সমস্ত দিকগুলো যথাযথ মেলবার সুযোগ পেয়েছে। দেখা না-দেখার মধ্যে সমন্বয় এবং অনুচ্চারিত সঙ্কেতের মধ্যে তাই না-বলা বাণীর সার্থক ধ্বনির ঠিকানা সর্বপ্রথম এনে দিল চলচ্চিত্র।

মোক্ষম এই মাধ্যমটিকে নিয়ে সৃষ্টিশীল মানুষেরা সেই থেকে বহুমুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মত্ত রয়েছেন। গোড়ার দিকে যা ছিল নেহাৎই সৃষ্টির পাগলামো, পরবর্তীকালে তাই হয়ে উঠল জীবন তথা সামাজিক দায়িত্বের অংশ। তখন সেটা কেবলমাত্র প্রমোদের মাধ্যম হয়েই তাদের কাছে বাঁধা হয়ে রইল না। সঙ্গে সঙ্গে জীবন নিয়ে ছবি করার মধ্যে একটা শর্ত এসে দেখা দিল। এই শর্তের নাম সততা। পরিচালকেরা যাঁরা এটাকে নেহাৎ ছেলেমানুষি বা প্রমোদের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করতে গররাজি, তাদের কাছে চলচ্চিত্র হল পরিচালকের স্ব-স্ব অনুভূতি ও উপলব্ধির যথাযথ প্রকাশ। এটা এখন সর্বজনগ্রাহ্য—সে সমস্ত শিল্পকর্মের মূলকথাই হল জীবনের সত্য উদ্‌ঘাটন। যে কোনো শিল্পকে তাই শিল্পপদবাচ্য হতে হলে প্রথমেই তাকে সত্যের অনুসারী হতে হবে। কেননা, সর্বকালের শিল্পবিচারে সত্যই হল প্রথম ও শেষ কথা।

তাই বলে শুধু সত্যের বিনিময়েই মহৎ শিল্প সৃষ্টি হবে তা নয়। সত্যের ওপর ভর করে নন্দনতত্ত্বের একটি উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষে তার সৃষ্টিকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। নইলে মহৎ সৃষ্টি

ব্যাপারটা অলক্ষে হাতছাড়া হতে বাধ্য। অবশ্য এর মধ্যে সৃষ্টিকারের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারটাও স্বভাবতই এসে যাচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সৃষ্টির প্রকাশভঙ্গিরও রকমফের ঘটতে থাকে। শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি রূপ পরিগ্রহ করে প্রধানত বাস্তবজগৎ থেকে। সেখান থেকে সে তার পছন্দমতো উপকরণ জোগাড় করে নেয়। সে ক্ষেত্রে শিল্পীর কাছে একালে নিরপেক্ষতা ব্যাপারটাই হাস্যকর। কেননা সে তার শিল্পের মাধ্যমে যা সৃষ্টি করছে তা অতি স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই হয়ে উঠছে তার বিচারবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গির আদল। ফলে অন্যের সঙ্গে তার অমিল ঘটাই স্বাভাবিক।

প্রথাগত ভাবনাচিন্তার পথ ছেড়ে যাঁরা বিশেষ একটি উদ্দেশ্য এবং সামাজিক কর্তব্যবোধ থেকে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনাগুলিকে তাদের শিল্পকর্মে সোচ্চারিত করেন তাঁদের নিয়েই আলোচনার প্রধানত সুযোগ থাকে। তাঁরা যে কেবলমাত্র নন্দনতত্ত্বের শুভ আবহাওয়া সৃষ্টির কর্মে ব্যাপৃত তাই নয়, পাশাপাশি এঁরা আপনাপন দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন বলেই এঁদের পথে বাধা অনেক। চিরাচরিত পথের সরলতাকে ছেড়ে এঁরা সহজেই নির্দ্বিধায় বেছে নেন শিল্পীজনোচিত পথের দুর্গমতা। অভাব আর বাধা তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও নন্দনতৃপ্তির ক্ষেত্রে এরাই প্রধান অংশীদার। যে কোনো উদারচেতা শিল্পীকে তাই কোনো না কোনো পর্বে এই অবস্থাটির সম্মুখীন হতে হয়। বস্তুত, সৎ ও নবীন সৃষ্টিকারের পক্ষে এর মোকাবিলা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

চলচ্চিত্র নির্মাণ ব্যাপারটাই যেহেতু বিবিধ শিল্পকলার যথার্থ একটি অবিমিশ্র রূপ সেইজন্যেই এই শিল্পেই পদস্খলনের সম্ভাবনাও সবচেয়ে বেশি। যাঁর হাতে ক্যামেরা এবং সংগীত, সাহিত্য এবং দৃশ্যমান সম্ভাবনার প্রাচুর্য, তাঁর পক্ষে দর্শককে ভোলানো নিশ্চয়ই কঠিন নয়। সুতরাং সে স্বয়ং উদ্দেশ্যবিহীন হলে প্রতিক্ষেত্রে দর্শককেই ঠকতে হয় বেশি। রুচিকে পিছিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে সেটাও যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে জীবনের প্রতি ভালোবাসা ও আস্থা কথাটাই হল মূল্যবান। অর্থাৎ মানুষকে ভালোবাসলেই একমাত্র ভালো ছবি করা সম্ভব।

বাস্তবজীবনের ভিড়ে ঠিক এর উলটো দিকটারই প্রাধান্য। এখানে মতলববাজ, মেকি, ধূর্ত এবং অভদ্র মানুষের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। নানা বর্ণে এরাই কমবেশি পরিমাণে সামাজিক ক্ষেত্রে সুফলের বেশি অংশকে শুষে নিচ্ছে। ভারতবর্ষের মতো একটা দেশের দিকে তাকালেই তা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। ফলে এখানে চলচ্চিত্রকেও তারা রেহাই দেয়নি। একদা মধ্যযুগীয় সংস্কার এবং দেবভক্তির প্রলেপ লাগানো শিল্পের ছাপ দিয়েই এদেশের চলচ্চিত্র-যাত্রা শুরু হয়েছিল। অন্য দিকে, অন্যান্য দেশে একটা আন্দোলন থেকে এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। এদেশে সিনেমার পত্তন হয়েছিল প্রধানত ব্যবসায়িক প্রয়োজনে। অধিকাংশ মানুষের মধ্যে চলচ্চিত্র বিজ্ঞান সম্পর্কে তখনো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল। চলচ্চিত্র এদেশে বহুকাল তাই সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি। যদিও ইউরোপে সে সময় চলচ্চিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রীতিমতো মেতে উঠেছিল। কিন্তু তার ঢেউ এদেশে সহজে তেমন দাগ কাটতে পারেনি।

ফলে আমাদের দেশে এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক মানের ছবির অভাবই প্রধানত লক্ষ করা যায়।

ব্যতিক্রম অবশ্যই প্রমথেশ বড়ুয়া। তিনি এই স্থূল ভাবনাচিন্তার মধ্যেও নিষ্ঠা সহকারে নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ পথে কিছুটা এগিয়েছিলেন। কিন্তু সদিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর হাত দিয়ে সদর্থে কালজয়ী ছবি পাওয়ার সুযোগ দর্শক পায়নি। মোটা দাগের গল্প নিয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু টেকনিকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া অন্য কিছু করার সুযোগ মেলেনি তাঁরও। দেবকী বসু বা বিমল রায় ও শৈলজানন্দ বা নীতিন বসুও অবশ্য পরিচ্ছন্ন ছবি করার চেষ্টার সূত্রপাত করেছিলেন। দর্শকের রুচি তৈরির কাজে সেদিক থেকে এঁদের অবদানও অবশ্যই স্বীকার্য। অন্যদিকে, প্রধানত দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালে বেশ কিছু ভালো ছবি দেখবার সুযোগ পেলেন এদেশের মানুষ। আর তখন থেকেই মালুম হল আমরা এই শিল্পের সঠিক কোন জায়গায় তখনো আটকে আছি। স্বাভাবিক অর্থেই আমাদের হাস্যকর অতীত প্রচেষ্টাগুলো চিন্তাশীল দর্শকের লজ্জার কারণ হয়ে উঠল। কোন ছেলেমানুষিতে সবাই এতদিন ভুলে ছিলেন তা সবাই হাড়ে হাড়ে টের পেলেন। বিশেষত সেদিন কয়েকটি ঐতিহাসিক ছবি দেখবার সুযোগ হয়েছিল দর্শকের যেগুলি বিশ্বের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে রীতিমতো সম্মানিত। ফলে প্রথাগত চিন্তাভাবনা তখন থেকেই প্রচণ্ডভাবে মার খেল। বাধ্য হয়ে কেউ কেউ অন্যপথে ভাবনাচিন্তা করতে শুরু করলেন। এঁরা বয়সে নবীন কিন্তু চিন্তায় মুক্তমতি। আন্তর্জাতিক ধ্যানধারণাকে অস্বীকার করে বড়ো গোছের কিছু করা যে আর সম্ভব নয়— এটা তাঁদের কাছে ধরা পড়ল। বাধ্য হয়ে উৎসাহীরা সাগরপারের দেশে চোখ মেলে তাকালেন। এটা ঠিক যে, কোনো কোনো ছবি সর্বদেশে সর্বকালে চিন্তার জগতে এসে প্রথমেই ধাক্কা দেয়। যেমন একদা এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে গ্রিফিথ[১] করেছিলেন তাঁর *ইনটলারেন্স* ও *বার্থ অব এ নেশন* ছবির মাধ্যমে। সোভিয়েতের বিপ্লবোত্তর ভাবনার কর্ণধার কুলেশভ্ ভবিষ্যৎ ছবির নিশানা পেয়েছিলেন তাঁরই মাধ্যমে। যোগ্য-শিষ্য আইজেনস্টাইন[২] আর পুডোভকিন[৩] স্থির করে ফেললেন কোনদিকে যেতে হবে। একটা ব্যাপার, এই দুই শিল্পীর অন্বেষার মাধ্যমেই সর্বপ্রথম বেরিয়ে এল যা ছিল পূর্বনির্ধারিত তা হল, ছবির চিন্তাভাবনায় ডায়লেকটিক্স-এর প্রভাব। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শটের ভিন্নমুখী প্রবণতার সার্থক মিলনেই সৃষ্টি হবে প্রার্থিত সার্থকতা। তৈরি হল *স্ট্রাইক, ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন* বা *মাদার*-এর মতো ছবি। সেইসব ছবিই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলাতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। ফলে এই শিল্প সম্পর্কে নতুনদের প্রভাবিত করে তুলল বিশ্ববরেণ্য এই সব কাজ। বিশেষ করে চলচ্চিত্র সম্পর্কে সিরিয়াস ভাবনা-চিন্তার গোড়াপত্তন হল তখন থেকেই। ওদেশে যা ঘটল আমাদের এখানকার শিল্পকর্ম তার তুলনায় প্রায় চল্লিশ বছর পিছিয়ে থাকলেও একটা কিছু করার তাগিদ—এরই মাধ্যমে সেদিন অনুভব করেছিলেন এদেশের স্বল্পসংখ্যক কিছু মানুষ।

---

১. D.W. Grifith, ২. Sergei Eigensteine, ৩. V. Pudovkin.

কিন্তু যুগান্তকারী কিছু সৃষ্টি করার পথে এদেশে বড়ো বাধা কারিগরি সুযোগ-সুবিধার সীমাবদ্ধতা। এখানে আনুষঙ্গিক মেশিনপত্রের ব্যবস্থা তেমন উন্নত ছিল না। আজও নেই। নিত্যনতুন পদ্ধতির ব্যবহারের সম্ভাবনার পথ তাই প্রথম থেকেই সঙ্কুচিত।

অন্যদিকে নানাবিধ কারণে আমরা বিশেষ করে বাংলা ছবির দর্শকগোষ্ঠী এই শিল্প সম্পর্কে বহুকাল যথার্থভাবে শিল্পজ্ঞানে শিক্ষিত হবার সুযোগ পাইনি। অবশ্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির রদবদলের সম্ভাবনাও কেউ কেউ অনুভব করেছিলেন। কিন্তু যাদের জন্যে ছবি তৈরি হবে তাদের ধ্যানধারণার পরিবর্তন না হলে যে ব্যর্থতা অনিবার্য তাই শেষ পর্যন্ত ঘটেছে সেকালের বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে। স্রষ্টারা দু-চারজন গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এর উন্নতির কথাই সেদিন ভেবেছেন। তাঁরা বেপরোয়া হয়ে এই শিল্পের মধ্যে মানসিক চিন্তাধারার বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন। অথচ এই নিষ্ঠা বা যোগ্যতার পুরস্কার যথাযথভাবে একমাত্র তাঁরা তখনই পেতে পারেন যখন দর্শকশ্রেণিও উন্নত রুচি এবং জ্ঞানের দ্বারা শিক্ষিত হয়ে উঠবেন। নিরীক্ষামূলক ছবির ক্ষেত্রে এই কথাটিই অধিকতর প্রযোজ্য। এই জন্যে ভালো ছবির মার্জিত দর্শকশ্রেণির অভাব থাকলে সামগ্রিকভাবে ভালো ছবি সৃষ্টির গোটা আন্দোলনটাও মার খেতে বাধ্য। আমাদের ভালো ছবি অর্থাৎ শিল্পগুণ সমন্বিত ছবিকেও আমরা প্রথমে পুরোপুরিভাবে বুঝতে ভুল করেছি বা বুঝতে পারিনি। অনেকক্ষেত্রে একমাত্র বিদেশিদের প্রশংসা পাওয়ার পরই সে ছবি আমাদের নতুন করে ভাবিয়েছে। আমরা তারপরে নতুন করে তার প্রশংসায় মেতে উঠেছি। সৎ চলচ্চিত্রের পক্ষে প্রাথমিক পর্বে এটা নিঃসন্দেহে একটা বড়ো সঙ্কট। তবু এই অবস্থাতেই আমাদের দেশে নতুন ভাবনাচিন্তার ঢেউ এল। কলকাতায় ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের মধ্যে যে আদর্শ বা চেতনার স্ফুরণ ঘটেছিল ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জীবনে নানাদিক থেকেই তা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার কথা নেতারা সেই সময়ে গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। ফলে নাটকের ক্ষেত্রে একটা স্থায়ী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। পুরোনো ভাবনাচিন্তার বদলে এল নতুন ভাবনার দিগ্‌দর্শন। সমাজের নবজাগরণের ক্ষেত্রে নাটক এবং গণসঙ্গীতও গুরুত্বপূর্ণ অংশী হয়ে উঠল।

এই আন্দোলনের শরিকরা অনেকেই তখন বৃহত্তর কোনো মাধ্যমকে গণ আন্দোলনের হাতিয়ার করে তোলার কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন। আর সেদিক থেকে সিনেমাই ছিল গণপ্রচারের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। সুস্থ ভাবনাচিন্তাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার পক্ষে এই মাধ্যমটি সবচেয়ে বেশি কার্যকরী। সীমাবদ্ধ সম্ভাবনার কথা স্মরণে রেখেও এই সব জেদী যুবকেরা সেদিন নানাদিক থেকে ভাবতে লাগলেন, তর্ক-বিতর্ক করলেন। চায়ের দোকানের আড্ডায় চলল তুলকালাম কাণ্ড। অবশ্যই সবটাই একটা বড়ো কিছু করতে হবে এই চিন্তা থেকেই সেদিনের নতুন নতুন ভাবনায় রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

অন্যদিকে বিদেশি ছবি দেখার স্বাদ পাওয়ার পর থেকেই সুস্থ শিল্পের উপাসক কিছু মানুষ একত্রিত হয়েছিলেন। এঁদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য আরো বেশি পরিমাণে ভালো ছবি দেখা ও আলাপ-আলোচনা করা। গোড়ায় এঁদের সামনে জোরালো কোনো রাজনৈতিক ভাবনা-চিন্তার প্রভাব ছিল না। যদিও এঁরা ছিলেন মহৎ শিল্পের অনুরাগী। শিল্পের সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া অনুধাবনই এঁদের উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে সুযোগ সম্ভাবনা এলে নিজের ভাবনা-চিন্তাকে ভাঙিয়ে, নিষ্ঠাকে সম্বল করে ভালো একটা ছবি করবার স্বপ্নও হয়তো তাঁদের ছিল। পথ হাতড়ে ফিরছিলেন সবাই। প্রচলিত বাংলা ছবির নিটোল গল্পসর্বস্ব মোটা দাগের ছবির বদলে তাঁদের ছিল নতুন কিছু করবার স্বপ্ন। ব্যাপারটা যে কতখানি কঠিন তা ভুক্তভোগী ছাড়া কল্পনা করাও অসম্ভব। তবু ঢোকবার চেষ্টা ছিল। গণনাট্যের তিনজন সৃষ্টিপাগল মানুষ কাকদ্বীপের আন্দোলনের পটভূমিকায় একটা ষোলো মিলিমিটারের নির্বাক ছবি করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কাহিনি: সলিল চৌধুরী, চিত্রনাট্য: মৃণাল সেন। ছবির নাম—*জমির লড়াই*। ভাঙা একটা ক্যামেরা জোগাড় করেছিলেন যিনি তাঁর নাম ঋত্বিককুমার ঘটক। সরকারের নজর এড়িয়ে সেই ছবি তোলার পরিকল্পনাটি শেষ পর্যন্ত অবশ্য বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে তখন থেকেই নতুন ভাবনাচিন্তার উঁকিঝুঁকি দেখা দিচ্ছিল। শুধু সুযোগের অপেক্ষা। মহৎ শিল্পের জন্যে অপেক্ষা ছাড়া উপায়ই বা কী!

অন্যদিকে ছবি নিয়ে পড়াশোনাও চলছিল। বিভিন্ন দেশের ছবির বিষয়বস্তু, টেকনিক ইত্যাদি নিয়ে মাথাঘামানোর দল ফিল্ম ক্লাব গড়ে তুললেন। উদ্দেশ্য: ভালো ছবি সম্পর্কে উৎসাহ সৃষ্টি এবং আলোচনা। সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, নিমাই ঘোষ— এঁরাই ছিলেন সেদিন ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোক্তা।

॥ দুই ॥

ঋত্বিককুমার তখন নিমাই ঘোষের *ছিন্নমূল* ছবির একজন মামুলি অভিনেতা। নিমাই ঘোষের মাধ্যমেই সত্যজিৎ এবং ঋত্বিককুমারের যোগাযোগ ঘটল। যদিও ফিল্ম সম্পর্কে ঋত্বিক তখনো তীব্রভাবে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর চোখে তখন মঞ্চ এবং নাটকের স্বপ্ন। তখন নাটক লেখা এবং অভিনয় নিয়েই তিনি ব্যস্ত। তাঁর কাছে রাজনৈতিক আদর্শের প্রচার মাধ্যম প্রধানত নাটক। সেই হাতিয়ারকে নিয়েই তিনি তখন এগোচ্ছিলেন। এছাড়া ছিল স্টুডিও কর্মীদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গঠন করা। সত্যজিৎ রায় তখন চাকরিতে ঢুকেছেন। ফিল্ম সোসাইটির নিষ্ঠামগ্ন কাজকর্মের মধ্যে তিনি বাকি সময়টা ব্যস্ত থাকতেন। ছবি করবার চিন্তাটা তাঁর মাথায়ও তখন ঘুরছিল। কিন্তু রেনোয়ার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে সেই ইচ্ছেটা সত্যজিতের আরও তীব্র হয়ে ওঠে। বিদেশে গিয়ে বহু ভালো ছবি দেখার সুযোগও সে সময় তিনি পেয়েছিলেন। চল্লিশের দশকে বিমল রায় পরিচালিত *মধ্যবর্তী* ছবির সহকারী পরিচালক হয়েছিলেন ঋত্বিক ঘটক। ১৯৪৮ সালে দাদা সুধীশ ঘটকের পরিচালিত এবং হরেন ঘোষের প্রযোজিত ও মনোজ বসু লিখিত *সৈনিক* ছবির সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন।